সূরা আন নহল-২য় রুকুঃ আয়াত সংখ্যাঃ(১০-২১)

Sisters'Forum In Islam.com

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আজকের রুকুর মূল বিষয় তাওহীদ

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে বিশ্বাস ও পালন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তাওহীদ শব্দের অর্থ হলো আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং একমাত্র ইবাদতের যোগ্য হিসেবে মেনে নেওয়া।

কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহর নির্দেশিত তাওহীদকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. তাওহীদ আর-রুবুবিয়্যাহ (প্রভুত্বে একত্ববাদ)

বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা, মালিক, এবং সমগ্র মহাবিশ্বের পরিচালক।

· মূল কথা: জন্ম দেওয়া, মৃত্যু দেওয়া, রিজিক দেওয়া এবং সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর।

২. তাওহীদ আল-উলুহিয়্যাহ (ইবাদতে একত্ববাদ)

কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য সমস্ত ইবাদত বা উপাসনা নির্দিষ্ট করা।

· মূল কথা: সালাত (নামাজ), দোয়া, কোরবানি, এবং সাহায্য প্রার্থনা—সবকিছু শুধুমাত্র আল্লাহর কাছেই করতে হবে। অন্য কোনো মানুষ, পীর, ফেরেশতা বা মূর্তির কাছে মাথা নত করা যাবে না।

৩. তাওহীদ আল-আসমা ওয়াস-সিফাত (নাম ও গুণাবলীতে একত্ববাদ)

পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদিসে আল্লাহর যেসব সুন্দর নাম ও মহান গুণের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে কোনো ধরনের বিকৃতি বা সৃষ্টির সাথে তুলনা না করে হুবহু বিশ্বাস করা।

· মূল কথা: আল্লাহর গুণাবলী অনন্য। যেমন—তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা, কিন্তু তাঁর শোনা বা দেখা কোনো সৃষ্টির মতো নয়।

আল্লাহর নির্দেশিত তাওহীদের গুরুত্ব:

· জান্নাতে যাওয়ার শর্ত: তাওহীদ ছাড়া কোনো ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

· শিরক থেকে মুক্তি: তাওহীদের বিপরীত হলো 'শিরক' (আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা), যা ইসলামের সবচেয়ে বড় গুনাহ। আল্লাহ তাআলা তাওহীদপন্থী মানুষের গুনাহ ক্ষমা করলেও শিরকের গুনাহ ক্ষমা করেন না (যদি না দুনিয়ায় তওবা করা হয়)।

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ১০ : ১৬

১০. তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন। তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা থেকে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক।

পূর্বের আয়াতসমূহে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যমীনে যে সমস্ত প্রাণী চলাফেরা করে তাদেরকে মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন সে ঘোষণা দিয়েছেন। এখানে আকাশ থেকে বৃষ্টি নাযিল করার মাধ্যমে মানুষের কি উপকার সাধিত হয় সেটা বর্ণনা করছেন। [ইবন কাসীর] এর মধ্যে প্রথমেই হচ্ছে পানি। তিনি আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেন সেগুলোকে তিনি সুমিষ্ট করেছেন, লবনাক্ত করেননি। [ইবন কাসীর] অনুরূপভাবে মানুষের জন্য বৃক্ষের ব্যবস্থা করেছেন। شجر শব্দটি প্রায়ই বৃক্ষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান থাকে। কোন কোন সময় এমন প্রত্যেক বস্তুকেও شجر বলা হয় যা ভূ-পৃষ্ঠে উৎপন্ন হয়। ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। আলোচ্য আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। [কুরতুবী] কেননা, এর পরেই জন্তুদের চলার কথা বলা হয়েছে। ঘাসের সাথেই এর বেশীর ভাগ সম্পর্ক। (تُسِيمُونَ) শব্দটির অর্থ জন্তুকে চারণক্ষেত্রে চরার জন্য ছেড়ে দেয়া। [কুরতুবী; ইবন কাসীর] অর্থাৎ তোমাদের জন্য এমন গাছের ব্যবস্থা করেছেন যাতে তোমাদের জীব-জন্তু চরে বেড়াতে পারে। [ইবন কাসীর]

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ • يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ১৬ : ১১
يَّتَفَكَّرُوْنَ

১১. তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বারা জন্মান শস্য, যায়তূন, খেজুর গাছ, আঙ্গুর এবং সব রকমের ফল। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

অর্থাৎ একই পানি দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বহু প্রকার ফল-ফলাদি, ভিন্ন ভিন্ন স্বাদে ও গন্ধে, ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতিতে উৎপন্ন করেন এটা নিশ্চয়ই এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

"নাকি তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানসমূহ ও যমীন এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি, তারপর আমরা তা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার গাছ উদগত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ আছে কি? বরং তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা (আল্লাহর) সমকক্ষ নির্ধারণ করে". সূরা আন-নামলঃ ৬০

() এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত ও অভিনব রহস্য সহকারে জগত সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তারা এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ পায়, যার ফলে আল্লাহ্ তা'আলার তাওহীদ যেন চোখের সামনে ফুটে উঠে। এ কারণেই নেয়ামতগুলোর উল্লেখ করে বার বার এ বিষয়ের প্রতি হুশিয়ার করা হয়েছে। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, এতে চিন্তাশীলদের জন্য প্রমাণ রয়েছে। কেননা, ফসল ও বৃক্ষ এসবের ফল ও ফুলের যে সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার কারিগরি ও রহস্যের সাথে রয়েছে তা কিছুটা চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে। মানুষের চিন্তা করা দরকার যে, শস্য কণা কিংবা আঁটি মাটির নিচে ফেলে রাখলে এবং পানি দিলে আপনা-আপনি বিরাট মহীরূহে পরিণত হতে পারে না এবং তা থেকে রঙ-বেরঙয়ের ফুল-ফল উৎপন্ন হতে পারে না। যা হয়, তাতে কোন কৃষক-ভূস্বামীর কর্মের দখল নেই। বরং সবই সর্বশক্তিমানের কারিগরি ও রহস্য।

তিনি একই পানি দ্বারা সেগুলোকে উৎপন্ন করেন, অথচ সেগুলোর প্রকার, স্বাদ, গন্ধ, রং, প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এগুলো সবই প্রমান করছে যে, তিনি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই। [ইবন কাসীর]

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ • بِاَمْرِهٖ ؕ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌ • وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ • وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ১৬ : ১২
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

১২. আর তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত, দিন, সূর্য ও চাঁদকে; এবং নক্ষত্ররাজিও তারই নির্দেশে নিয়োজিত। নিশ্চয় এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে অনেক নিদর্শন।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে তাঁর কিছু নেয়ামত হিসেব করে দেখিয়ে দিচ্ছেন। [ইবন কাসীর] আল্লামা শানকীতী বলেন, এ আয়াতে আল্লাহ বর্ণনা করছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ নেয়ামত নিয়োজিত করেছেন। এগুলোতে যে বিরাট উপকারিতা রয়েছে সেটা তিনি ব্যতীত কেউ পুরোপুরি জানে না। বিবেকবানদের কাছে এগুলোই

স্পষ্ট প্রমাণ দিচ্ছে যে, তিনি একজনই একমাত্র ইবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত। সে পাঁচটি নেয়ামত হচ্ছে, রাত, দিন, সূর্য, চন্দ্র ও তারকা।

কুরআনে বারবার এ নেয়ামতগুলোকে নিয়োজিত করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে এগুলো উল্লেখ করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে। যেমন,

"নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ্ যিনি আসমানসমূহ ও যমীন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন।

তিনিই দিনকে রাত দিয়ে ঢেকে দেন, তাদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর সূর্য, চাদ ও নক্ষত্ররাজি, যা তারই হুকুমের অনুগত, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তারই সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ কত বরকতময়।" [সূরা আল-আরাফ: ৫৪]

আরও বলেছেন, "আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চাঁদকে, যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে।" [সূরা ইবরাহীম: ৩৩]

আরও বলেছেন, "আর তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত, তা থেকে আমরা দিন অপসারিত করি, তখন তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। আর চাঁদের জন্য আমরা নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল; অবশেষে সেটা শুষ্ক বাঁকা, পুরোনো খেজুর শাখার আকারে ফিরে যায়।" [সূরা ইয়াসীন ৩৭-৩৯] আরও বলেন, "আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।" [সূরা আল-মুলক: ৫] অন্য আয়াতে বলেছেন, "আর তারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথনির্দেশ পায়।" [সূরা আন-নাহ্ল: ১৬] [আদওয়াউল বায়ান]

() এখানে বলা হয়েছে যে, দিনরাত ও তারকারাজি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের অনুগত হয়ে চলে। শেষে বলা হয়েছে যে, এগুলোর মধ্যে বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক প্রমাণ রয়েছে। যারা আল্লাহ যে সমস্ত ব্যাপারে সাবধান করতে চেয়েছেন সেগুলো বুঝে, যাদেরকে আল্লাহ সেটা বুঝার তাওফীক দিয়েছেন তাদের জন্য এতে আল্লাহর প্রচণ্ড ক্ষমতা ও অপার শক্তির অনেক নিদর্শন রয়েছে। [কুরতুবী; ইবন কাসীর]

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّقَوْمٍ یَّذَّكَّرُوْنَ • وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِی الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ১৬ : ১৩

১৩. আর তিনি তোমাদের জন্য যমীনে যা সৃষ্টি করেছেন, বিচিত্র রঙের করে, নিশ্চয় তাতে সে সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

আসমানের বিভিন্ন চিহ্ন ও নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার আহবান জানানোর পর এখানে মাটিতে যে আশ্চর্যজনক বিষয়াদি ও বিভিন্ন বস্তু রয়েছে যেমন, জীবজন্তু, খনিজ সম্পদ, উদ্ভিদরাজি ও নিশ্চল রং-বেরং এর ও বিভিন্ন প্রকৃতির সৃষ্টিসমূহ রয়েছে, সেগুলোর যে উপকারসমূহ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ রয়েছে এর মধ্যে অবশ্যই তাদের জন্য প্রমাণ রয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে। যারা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ স্মরণ করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়। [ইবন কাসীর]

وَتَرَی الْفُلْكَ 💔وَهُوَ الَّذِیْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِیًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْیَةً تَلْبَسُوْنَهَا ১৬ : ১৪ مَوَاخِرَ فِیْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

১৪. আর তিনিই সাগরকে নিয়োজিত করেছেন যাতে তোমরা তা থেকে তাজা (মাছের) গোশত খেতে পার এবং যাতে তা থেকে আহরণ করতে পার রত্নাবলী যা তোমরা ভূষণরূপে পরে থাক; এবং তোমরা দেখতে পাও, তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং এটা এ জন্যে যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর;

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টবস্তু এবং এগুলোতে মানুষের উপকার বর্ণনা করার পর এখন সমুদ্রগর্ভে মানুষের উপকারের জন্য কি কি নিহিত রয়েছে, সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে। সমুদ্রে মানুষের খাদ্যের চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখান থেকে মানুষ টাটকা গোশত লাভ করে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

() এটা সমুদ্রের দ্বিতীয় উপকার। ডুবুরীরা সমুদ্র থেকে মূল্যবান অলঙ্কার সামগ্রী বের করে আনে حِلْيَةً এর শাব্দিক অর্থ শোভা, সৌন্দর্য। এখানে ঐসব রত্নরাজি ও মণিমুক্তা বোঝানো হয়েছে, যা সমুদ্রগর্ভ থেকে নির্গত হয় এবং মহিলারা এর দ্বারা অলঙ্কার তৈরী করে বিভিন্ন পন্থায় ব্যবহার করে। এ অলঙ্কার মহিলারা পরিধান করে থাকে; কিন্তু কুরআন পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করে تَلْبَسُونَهَا বলেছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মহিলাদের অলঙ্কার পরিধান করা প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের দেখার স্বার্থে। [ফাতহুল কাদীর]

() এটা সমুদ্রের তৃতীয় উপকার। (فُلْكَ) শদের অর্থ নৌকা। مَوَاخِرَ শব্দটি ماخرة এর বহুবচন। مخر এর অর্থ পানি ভেদ করা। অর্থাৎ ঐসব নৌকা ও সামুদ্রিক জাহাজ, যেগুলো পানির ঢেউ ভেদ করে পথ অতিক্রম করে। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রকে দূর-দূরান্তের দেশে সফর করার রাস্তা করেছেন এবং দূর-দূরান্তে সফর করা ও পণ্যদ্রব্য আমদানী-রপ্তানী করা সহজ করে দিয়েছেন। একে জীবিকা উপার্জনের একটি উত্তম উপায় সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, সমুদ্রপথের ব্যবসা-বাণিজ্য করা সর্বাধিক লাভজনক

পানির উপর নৌকা ও জাহাজ তথা জলযানসমূহের চলাচলও একটি বিরাট প্রমাণ। পানিকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক তরল পদার্থ করে সৃষ্টি করেছেন যে, একান্ত তরল ও প্রবাহমান হওয়া সত্ত্বেও তার পিঠের উপর লক্ষ লক্ষ মণ ওজনবিশিষ্ট বিশালাকায় জাহাজ বিরাট ওজনের চাপ নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলাচল করে।

তদুপরি এগুলোকে গতিশীল করে তোলার জন্য বাতাসের গতি ও নিতান্ত রহস্যপূর্ণভাবে সে গতির পরিবর্তন করতে থাকা প্রভৃতি বিষয়ও এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, এগুলোর সৃষ্টি ও পরিচালনার পিছনে এক মহাজ্ঞানী ও মহা বিজ্ঞ সত্তা বিদ্যমান। পানীয় পদার্থগুলো তরল না হলে যেমন এ কাজটি সম্ভব হত না, তেমনি বাতাসের মাঝে গতি সৃষ্টি না হলেও জাহাজ চলতে পারত না; এগুলোর পক্ষে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করাও সম্ভব হত না।

মহান আল্লাহ বলেন, "তিনি ইচ্ছে করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্রপৃষ্ঠে। নিশ্চয়ই এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক চরম ধৈর্যশীল ও একান্ত কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।" [সূরা আশ-শুরা ৩৩]

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ১৫ : ১৬

১৫. আর তিনি যমীনে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে যমীন তোমাদের নিয়ে হেলে না যায় এবং স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথসমূহ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌছতে পার

رَوَاسِيَ শব্দটি رَاسِيَة এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী পাহাড়। تَمِيد শব্দটি ميد থেকে উদ্ভুত। এর অর্থ আন্দোলিত হওয়া এবং অস্থিরভাবে টলমল করা। [ফাতহুল কাদীর] আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অনেক রহস্যের অধীনে ভূ-মণ্ডলকে নিবিড় ও ভারসাম্যবিহীন উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেননি। তাই এটা কোন দিক দিয়ে ভারী এবং কোন দিক দিয়ে হাল্কা হয়েছে। অন্যথায় এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল, ভূ-পৃষ্ঠের অস্থিরভাবে আন্দোলিত হওয়া। এই অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা এবং পৃথিবীর উৎপাদনকে ভারসাম্যপূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে পাহাড়ের ওজন স্থাপন করেন- যাতে পৃথিবী অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে না পারে। তাই এখানে (أَنْ تَمِيْدَ) এর পূর্বে كَرَاهِيَة বা أن এর পরে لا শব্দটি উহ্য ধরে নিয়ে অর্থ করতে হবে। [ফাতহুল কাদীর]

এ আয়াত থেকে জানা যায়, ভূপৃষ্ঠে পর্বত শ্রেণী স্থাপনের উপকারিতা হচ্ছে, এর ফলে পৃথিবীর আবর্তন ও গতি সুষ্ঠ ও সুশৃংখল হয়। কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় পাহাড়ের এ উপকারিতা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, পাহাড়ের অন্য যে সমস্ত উপকারিতা আছে সেগুলো একেবারেই গৌণ। মূলত মহাশূন্যে আবর্তনের সময় পৃথিবীকে আন্দোলিত হওয়া থেকে রক্ষা করাই ভূপৃষ্ঠে পাহাড় স্থাপন করার মুখ্য উদ্দেশ্য। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর]

অর্থাৎ নদ-নদীর সাথে যে পথ তৈরী হয়ে যেতে থাকে। বিশেষ করে পার্বত্য এলাকাসমূহে এসব প্রাকৃতিক পথের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। অবশ্যি সমতল ভূমিতেও এগুলোর গুরুত্ব কম নয়। উপরে বাণিজ্যিক সফরের কথা বলা হয়েছে। তাই এসব সুযোগ-সুবিধার কথা এখানেও সমীচীন মনে হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা পথিকদের পথ অতিক্রম ও মন্যিলে-মকসুদে পৌছার জন্য ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন। তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে وَعَلَامَاتٍ অর্থাৎ আমি অনেক চিহ্ন স্থাপন করেছি। [ইবন কাসীর] বলাবাহুল্য, ভূ-পৃষ্ঠ যদি একটি চিহ্নবিহীন পরিমণ্ডল হতো তবে মানুষ কোন গন্তব্যস্থানে পৌছার জন্য পথিমধ্যে কতই না ঘুরপাক খেত।

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ • وَعَلٰمٰتٍ ১৬ : ১৬

১৬. এবং পথ নির্দেশক চিহ্নসমূহও। আর তারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথনির্দেশ পায়।

এখানে মহান আল্লাহ তাআলা মানবজাতির কল্যাণে পৃথিবীতে তৈরি করা বিভিন্ন ধরণের স্বাভাবিক দিকনির্দেশক (যেমন- পাহাড়, নদী, বৃক্ষ ইত্যাদি) এবং মহাকাশের নক্ষত্ররাজির কথা উল্লেখ করেছেন, যা মানুষ পথ চেনার জন্য ব্যবহার করে।

আয়াতের মূল শিক্ষা ও তাৎপর্য:

· স্থলপথের নির্দেশক: দিনের বেলা মানুষ পাহাড়, পর্বত, নদী বা নির্দিষ্ট কোনো গাছপালা দেখে দিক ও পথ ঠিক করে।

· নভোমণ্ডলের নির্দেশক: প্রাচীনকাল থেকে আজ অব্দি মানুষ বিশেষ করে মরুভূমি বা গভীর সমুদ্রে রাতের অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেললে আকাশের নক্ষত্র বা তারা দেখে দিক নির্ণয় করে (যেমন- ধ্রুবতারা দেখে উত্তর দিক চেনা যায়)।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে পথ চলার জন্য কেবল বুদ্ধিই দেননি, বরং প্রকৃতির বুকেও অসংখ্য নিদর্শন ও পথনির্দেশক রেখে দিয়েছেন।

অর্থাৎ দিনের বেলায় পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য তিনি যেমন কিছু নিদর্শন রেখেছেন, তেমনি রাতের বেলায় পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য রেখেছেন তারকাসমূহ। দিনের বেলায় বিভিন্ন নিদর্শন দেখে আর রাতের বেলায় তারকাদের অবস্থান দৃষ্টে মানুষ বলতে পারে যে, তার গন্তব্যস্থল কোথায় হতে পারে। [জালালাইন, মুয়াসসার] আল্লাহ সমগ্র যমীনকে একই ধারায় সৃষ্টি করেননি। বরং প্রত্যেকটি এলাকাকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। এর অন্যান্য উপকারিতার মধ্যে একটি অন্যতম উপকারিতা হচ্ছে এই যে, মানুষ নিজের পথ ও গন্তব্য আলাদাভাবে চিনে নেয়।

সুতরাং তারকারাজি সৃষ্টি করার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, রাস্তার পরিচয় লাভ। এগুলোর দ্বারা কোন প্রকার ভাগ্য বা সৃষ্টিজগতের পরিচালনার নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করা কুফরী। কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ তারকাসমূহ তিনটি কারণে সৃষ্টি করেছেন, আকাশের সৌন্দর্য, শয়তানদের বিতাড়নকারী এবং কিছু আলামত যা দ্বারা পথের দিশা পাওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং যে কেউ এর বাইরে অন্য কিছু দিয়ে এগুলোর ব্যাখ্যা করবে সে অবশ্যই ভুল করবে, তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে, এবং এমন বস্তুর পিছনে অযথা দৌড়াবে যার ব্যাপারে তার কোন জ্ঞান নেই। [বুখারীঃ ৬/৩৪১]

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নক্ষত্র বা তারার সাহায্যে পথ খোঁজার (Celestial Navigation) মূল বিষয়গুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. সেলেস্টিয়াল নেভিগেশন (Celestial Navigation)

মহাকাশবিজ্ঞান এবং নৌবিজ্ঞানের ভাষায় আকাশের সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্রের অবস্থান দেখে পথ চলাকে সেলেস্টিয়াল নেভিগেশন বলা হয়। আধুনিক নেভিগেশন সিস্টেম আবিষ্কারের আগে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ সমুদ্রের মাঝে বা মাইলের পর মাইল বিস্তৃত মরুভূমিতে এই বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করত।

২. ধ্রুবতারা (Polaris / North Star) এবং দিক নির্ণয়

বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী, রাতের আকাশে দিক চেনার সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক মাধ্যম হলো ধ্রুবতারা (Polaris)।

· বৈজ্ঞানিক কারণ: পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের ঠিক ওপরে (উত্তর মেরুর সোজাসুজি) অবস্থান করার কারণে ধ্রুবতারা তার স্থান পরিবর্তন করে না। বাকি সব নক্ষত্রকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে যেতে দেখা গেলেও ধ্রুবতারা সবসময় নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির থাকে।

· ব্যবহার: উত্তর গোলার্ধের যেকোনো স্থান থেকে রাতের আকাশে ধ্রুবতারাকে দেখলে সরাসরি উত্তর দিক নিশ্চিত হওয়া যায়। উত্তর দিক জানা গেলে বাকি তিন দিক (দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম) সহজেই হিসাব করা সম্ভব।

৩. কনস্টেলেশন বা নক্ষত্রপুঞ্জ (Constellations

আকাশের তারাগুলো এলোমেলো মনে হলেও বিজ্ঞান বলে, এদের নির্দিষ্ট কিছু জ্যামিতিক বিন্যাস বা দল আছে, যাদের নক্ষত্রপুঞ্জ বলা হয়। যেমন:

· সপ্তর্ষি মণ্ডল (Big Dipper / Ursa Major): এটি দেখতে একটি বড় চামচ বা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো। এর শেষের দুটি তারাকে সোজা রেখায় বর্ধিত করলে ধ্রুবতারাকে খুঁজে পাওয়া যায়।

· কালপুরুষ (Orion): শীতকালে আকাশের এই নক্ষত্রপুঞ্জটি দেখে খুব সহজেই পূর্ব ও পশ্চিম দিক নির্ধারণ করা যায়। এর মাঝখানের তিনটি তারা (Orion's Belt) প্রায় নিখুঁতভাবে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর অবস্থান করে।

৪. আধুনিক বিজ্ঞানে এর ব্যবহার

আপনি জানলে অবাক হবেন যে, আজকের ডিজিটাল যুগেও এই বিজ্ঞানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

· মহাকাশযান ও স্যাটেলাইট: পৃথিবীর জিপিএস সিস্টেম ফেইল করতে পারে, কিন্তু মহাকাশের নক্ষত্ররা কখনো পথ হারায় না। তাই নাসা (**NASA**) এবং অন্যান্য মহাকাশ গবেষণা সংস্থা তাদের দূরপাল্লার মহাকাশযান ও স্যাটেলাইটের দিক ঠিক রাখার জন্য "স্টার ট্র্যাকার" (**Star Tracker**) নামক বিশেষ ক্যামেরা ব্যবহার করে। এই ক্যামেরা আকাশের তারার ছবি তুলে সফটওয়্যারের মাধ্যমে হিসাব করে মহাকাশযানটি কোন দিকে যাচ্ছে।

· নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী: আধুনিক সাবমেরিন এবং যুদ্ধবিমানের চালকদের এখনো ব্যাকআপ হিসেবে সেলেস্টিয়াল নেভিগেশন শেখানো হয়, যাতে রাডার বা জিপিএস হ্যাক বা নষ্ট হয়ে গেলেও তারা তারার অবস্থান দেখে নিরাপদে ফিরে আসতে পারে।

اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ • اَفَمَنْ يَّخْلُقُ كَمَنْ لَّا يَخْلُقُ ১৭ : ১৬

১৭. কাজেই যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার মত যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?

অর্থাৎ যদি তোমরা একথা মানো (যেমন বাস্তবে মক্কার কাফেররাও এবং দুনিয়ার অন্যান্য মুশরিকরাও মানতো) যে, একমাত্র আল্লাহই সব কিছুর স্রষ্টা বরং এ বিশ্বজগতে তোমাদের উপস্থাপিত শরীকদের একজনও কোন কিছুই সৃষ্টি করেননি, তাহলে স্রষ্টার সৃষ্টি ব্যবস্থায় অস্রষ্টাদের মর্যাদা কেমন করে স্রষ্টার সমান হতে পারে? যদি তা না হয় তবে তার ইবাদাত ব্যতীত অন্যের ইবাদাত কেন করা হবে? তিনিই তো তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, রিযকদাতা, তাঁর সাথে এই যে মূর্তিগুলোর ইবাদাত করা হয় সেগুলোও তো সৃষ্ট। সেগুলো কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। যারা সেগুলোর ইবাদাত করে তাদের জন্যও এরা সামান্যতম লাভ বা ক্ষতি বয়ে আনতে পারে না। [ফাতহুল কাদীর]

১. সৃষ্টি করার ক্ষমতার তুলনা (আল্লাহ বনাম মিথ্যা উপাস্য)

সূরা আন-নাহলের মতোই অন্যান্য আয়াতেও আল্লাহ তাআলা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কেউ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না।

· "হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে শোনো: তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো, তারা সবাই একত্র হলেও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না; বরং মাছিটি যদি তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু কেড়ে নেয়, তবে তাও তারা তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না..." • সূরা আল-হাজ্জ ৭৩:"

·:"তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন সব উপাস্য গ্রহণ করেছে, যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। তারা নিজেদের কোনো অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না..." সূরা আল-ফুরকান ৩

২. শূন্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ক্ষমতা

আল্লাহ যে নিখুঁতভাবে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এর বিপরীতে অন্য কারো কোনো ভূমিকা নেই, তা বোঝাতে নিচের আয়াতগুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক:

· সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ৫৪:"...জেনে রেখো, সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা কেবল তাঁরই কাজ। মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহ কত বরকতময়।"

· সূরা আত-তূর, আয়াত ৩৫-৩৬:"তারা কি কোনো কিছু ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে, নাকি তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি তারা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? প্রকৃতপক্ষে তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না।"

৩. মানুষের চিন্তা ও বিবেককে প্রশ্ন করা (তাদাব্বুর)

সূরা আন-নাহলের ১৭ নম্বর আয়াতের শেষে যেমন বলা হয়েছে—"তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?", ঠিক একইভাবে মানুষের বিবেককে নাড়া দেওয়ার মতো আরও আয়াত রয়েছে:

:"জিজ্ঞেস করো, 'কে তোমাদের আসমান ও জমিন থেকে রিজিক দেন? অথবা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির মালিক কে? কে জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন?...' তারা বলবে, 'আল্লাহ'। তাহলে বলো, 'তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না?'"সূরা ইউনুস, ৩১

·:"নাকি তিনি, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন পানি... আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো উপাস্য আছে? তবুও তারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।" সূরা আন-নামল ৬০:"

إِنَّ اللهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ • وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا ১৬ : ১৮

১৮. আর তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গুণলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু।

وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ১৬ : ১৯

১৯. আর তোমরা যা গোপন রাখ এবং যা ঘোষণা কর আল্লাহ তা জানেন।

আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করার পরপরই তাঁর ক্ষমাশীল ও করুণাময় হবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার যে নেয়ামত মানুষের উপর আছে তা দাবী করছে যে মানুষ সর্বদা তাঁর শোকরগুজার হবে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর অপার মহিমায় তাদের অপরাধ মার্জনা করেন। যদি তোমাদেরকে তার প্রতিটি নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করতে বাধ্য করা হতো, তবে তোমরা কেউই সেটা করতে সক্ষম হতে না। যদি এ ধরণের নির্দেশ আসতো তবে তোমরা দুর্বল হয়ে যেতে এবং তা করা ছেড়ে দিতে আর যদি তিনি এর জন্য তোমাদেরকে আযাব দিতেন তবে তিনি যালেম বিবেচিত হতেন না।

সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ৩৪: "...যদি তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করো, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অকৃতজ্ঞ।"

কিন্তু আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল। অনেক কিছুই তিনি ক্ষমা করে দেন, অল্প কিছুরই শাস্তি দিয়ে থাকেন। [ইবন কাসীর] তোমরা যদি তার কোন কোন নেয়ামতের শোকর আদায় করতে কিছুটা কসূর করে ফেল, তারপর তাওবাহ করো এবং তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির দিকে ফিরে আসো তবে তিনি তোমাদেরকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবেন। তাওবাহ ও তার দিকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তো তোমাদের জন্য অতিশয় দয়ালু। [তাবারী]

আল্লাহকে অস্বীকার এবং শিরক ও গোনাহের কাজ করা সত্ত্বেও আল্লাহর অনুগ্রহের সিলসিলা বন্ধ না হওয়ার কারণ আল্লাহ লোকদের কার্যকলাপের কোন খবর রাখেন না,----কোন নির্বোধ যেন একথা মনে না করে বসে। এটা অজ্ঞতার কারণে আন্দাজে ভাগ-বাঁটোয়ারা করার বা ভুলে কাউকে দান করে দেবার ব্যাপার নয়। এটা তো সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার ব্যাপার। অপরাধীদের গোপন ভেদ বরং তাদের মনের গহনে লুকিয়ে থাকা সংকল্পগুলোর বিস্তারিত চেহারা জানার পরও এ ধরনের সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা প্রদর্শন করা হচ্ছে। এটা এমন পর্যায়ের সৌজন্য, দানশীলতা ও ঔদার্য যে একমাত্র রব্বুল আলামীনের পক্ষেই এটা শোভা পায়।

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ ١٦ : ٢٠

২০. আর তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়।

اَيَّانَ يُبْعَثُوْنَ • وَمَا يَشْعُرُوْنَ • اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ ١٦ : ٢١

২১. তারা নিষ্প্রাণ, নির্জীব এবং কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সে বিষয়ে তাদের কোন চেতনা নেই।

আগের আয়াতে বলা হয়েছিল যে, এ সমস্ত উপাস্যগুলো নিজেরা কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। এ আয়াতে তা আরও স্পষ্ট বর্ণনা দিচ্ছে যে, কাফেরদের উপাস্যগুলো ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য নয়। কারণ, সেগুলো কাউকে সৃষ্টি যেমন করতে পারে না। তেমনি নিজেরাও অন্যদের দ্বারা সৃষ্ট। পূর্বের আয়াতে শুধু তাদের ভাল গুণ অস্বীকার করা হয়েছিল। এখানে ভাল গুণ অস্বীকার করার সাথে সাথে খারাপ গুণও সাব্যস্ত করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

অতি ভক্তের দল এসব সত্তাকে সংকট নিরসনকারী, অভিযোগের প্রতিকারকারী, দরিদ্রের সহায়, ধনদাতা এবং আরো কত কিছু মনে করে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য ডাকতে থাকে। অথচ এরা আসলে মৃত নিশ্চল বস্তু এগুলোতে কোন রূহ নেই। এগুলো কোন কথা শুনে না, দেখে না, বুঝেও না। আরও অতিরিক্ত হচ্ছে যে, এগুলো জানে না কখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, তাহলে তাদের কাছে কিভাবে কোন উপকারের আশা করা যেতে পারে? কিভাবে সওয়াব ও প্রতিদানের আশা তাদের কাছে করা যায়? এটা তো শুধু তার কাছ থেকেই জানা যায় যে সবকিছু জানে এবং সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। [ইবন কাসীর]

মৃত বলতে প্রাণহীন ও চেতনাহীন জড় (পাথর)ও বটে এবং মৃত সৎলোকও বটে। কারণ মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের কথা বলা (যে ব্যাপারে তাদের কোন বোধ নেই) জড় ব্যতীত সৎলোকেদের জন্যই বেশী সঙ্গত বলে মনে হয়। তাদেরকে শুধু মৃতই বলা হয়নি; বরং জীবিত নয় বলে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যাতে কবর পূজার স্পষ্ট খন্ডন হচ্ছে। যারা বলে কবরে দাফন হওয়া ব্যক্তি মৃত নয়, জীবিত। আর আমরা জীবিতদেরকেই ডাকি। আল্লাহর এই কথার পর জানা গেল মৃত্যু এসে যাওয়ার পর পার্থিব জীবন কেউ পেতে পারে না, আর না পৃথিবীর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকে।